MESSAGE

CONVOCATION SPEAKER

Selina Hossain
Writer and winner of Ekushey Padak

Message

I express my heartfelt congratulations to the 13th graduating batch of East West University. Because today's convocation ceremony marks another milestone in East West University's ongoing journey towards a secure and glorious future, I would like to congratulate the Trustees, Vice-Chancellor, Faculty and Staff of the university as well.

I am happy to learn that in nearly two decades East West University has achieved a distinctive place of its own in the academic world and has contributed significantly in building up a generation who are knowledgeable, skilled, responsible and adept in professional life.

On this auspicious occasion, my advice to the graduates would be to proceed further in life based on the institutional foundation that has been laid for them by their renowned university. I hope their precious experience will help them embrace all the opportunities, obstacles and challenges of the outside world with a winning spirit. At this transitional moment of your life, I will ask you not only to work towards self-improvement, but also to give something back to the institution and the country that has nurtured you all along.

I wish all the graduating students the best of luck and this convocation every success.

Selina Hossain

ADDRESS OF THE

CONVOCATION SPEAKER

সেলিনা হোসেন
সাহিত্যিক এবং একুশে পদক প্রাপ্ত

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রয়োদশ সমাবর্তন উপলক্ষে
সমাবর্তন বক্তার ভাষণ

শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য ও মানবজীবন

শিক্ষা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। চিন্তা, যুক্তি, আবেগ, মেধা দিয়ে যে জীবন পরিচালিত হয় তাকে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা। শিক্ষা সেই প্রকৃত জ্ঞান যা মানুষের কর্মের স্বরূপকে ব্যাখ্যা করে, নির্ধারিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে এবং কল্যাণ-মঙ্গলের পথে পরিচালিত হওয়ার দিক-নির্দেশনা দেয়। যারা এর থেকে বিচ্যুত হয় তারা প্রকৃত শিক্ষার বাইরের মানুষ। এই অর্থে শিক্ষা মানুষের সততা-নৈতিকতাসহ জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় বেঁচে থাকার মৌলিক শর্ত। এই শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হলে দেশ ও জাতি হারায় তার মর্যাদার জায়গা। হারায় গৌরব এবং ডুবে যায় বেঁচে থাকার অর্থহীনতায়।

বিশেষজ্ঞের মতে শিক্ষা শব্দটির উৎস ল্যাটিন ভাষা। এডুকেশন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ই ডিউকো'। এর মানে 'টু ব্রিং আউট'। সহজ বাংলায় বলা যায় 'বের করে আনা'। একজন শিক্ষার্থীর বুকের ভেতরে যে মেধা-দক্ষতা-সৃজনশীলতা থাকে তাকে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে বের করে আনা এই কাজটি করা শিক্ষার ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছেন, 'ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না তাহাদিগকে কোথায় বাল্যযাপন করিতে হয় – বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে-ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে।'

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে আরও বলেছেন বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার অনেক সারৎসার রুদ্ধ হয়ে আছে। বলেছেন, 'বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের

মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।'

পাওলো ফ্রেইরি (Paulo Freire) তাঁর Pedagogy of the Oppressed - 'নিপীড়িতদের শিক্ষণতত্ত্ব' বইয়ের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৭০ সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। সে বইয়ে শিক্ষাকে তিনি শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। বিশ্ব পরিবর্তনের জন্য এই শক্তি প্রসারিত কার্যক্রম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাঁর এই তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা পদ্ধতিতে সংলাপ এবং ব্যক্তির আত্মসচেতনতাকে উদ্বুদ্ধ করার ওপর গুরুত্ব দেয়া। তিনি মনে করতেন, সংলাপ দ্বারা নিপীড়িত মানুষ তার সমস্যা বুঝবে এবং সচেতন হয়ে নিজের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নামবে। ব্যক্তির সচেতনতা ছাড়া জীবনযাপনের পরিমাপ হয় না। অধিকারের লড়াই ছাড়া মানবিকতার বোধ সমুন্নত হয় না। জনগোষ্ঠীর মানবিক চেতনাকে শাণিত করে শিক্ষা। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পাওলো ফ্রেইরির এই শিক্ষাতত্ত্ব বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছিল। এই আলোকে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছিল বেশ কিছু উন্নয়ন সংস্থা। আর এটাতো সত্যি শিক্ষার নৈতিকবোধ, মানবিক চেতনা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং নিজ জনগোষ্ঠীর শেকড়ের সন্ধান দেশের প্রতিটি নাগরিকের বুকের ভেতরে না থাকলে জাতির এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা যদি একটি গোষ্ঠীকে বড় করতে চায় তাহলে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী সেই গোষ্ঠীর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং সামগ্রিক কল্যাণের জায়গাটি অনুচ্চারিত রইবে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই ব্যবস্থা কোনো রাষ্ট্রেরই কাম্য নয়। সেজন্য শিক্ষার বিষয়টিকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করতে হয়। একটি উদাহরণ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি আসতে পারে। যদি বলি শিক্ষার সমস্ত উৎস মূলে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই, তাহলে ভুল বলা হবে না। শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যে আহরণ করে সে কখনো সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের উর্ধে মানবধর্মই তার কাছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষের প্রবৃত্তির হীনতা-নিচতাকে ধর্ম প্রশ্রয় দেয় না। বরং সহিষ্ণুতা, মানবসেবার কথা সব ধর্মই বলে। লাকুম দীনু-কুম ওয়া লিয়া দ্বীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। যখন উচ্চারিত হয় 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক' তা জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। যখন বলা হয় 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'– এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর কি হতে পারে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আয়োজন তা মানুষের জন্য – মানুষের পরিপূরক প্রাণীকূল এবং প্রকৃতির জন্য।

সাম্প্রদায়িক চেতনা ধর্মকে মহীয়ান করে না। এই চেতনা ধর্ম থেকেও আসেনি। মূলত এর যোগ রাজনীতির সঙ্গে। রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের বাসনা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চিন্তা থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ায়। ধর্মান্ধ মানুষের বিবেকবোধ এর দ্বারা উপড়ে যায়। নৃশংস হয়ে ওঠাকে সে তখন নিজের অধিকার বলে মনে করে। তার নৈতিকবোধ এতে আহত হয় না। এ ধরনের জীবন বিমুখতার অন্য আরও দিক আছে। যেমন ব্রাজিলের সামরিক সরকার

পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষা দর্শনের জন্য তাকে কারারুদ্ধ করে। শিক্ষার দ্বারা হতদরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের চিন্তা সামরিক সরকারের পছন্দ হয়নি। শেষ পর্যন্ত পাওলো ফ্রেইরি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। চিলিতে নির্বাসিত জীবনযাপন করার সময় তিনি Pedagogy of the Oppressed লিখেছিলেন। ব্রাজিলের তখনকার সামরিক সরকার শিক্ষা দর্শনের সঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে এক করে দেখতে পারেনি বলে একজন জ্ঞানী মানুষের শিক্ষাদর্শন গ্রহণ না করে তাকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। সামগ্রিক অর্থে এটি হলো শিক্ষার অপচয়।

ইতিহাস থেকে আমরা গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর শিক্ষাদর্শন আলোচনায় আনতে পারি। তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন প্রাবন্ধিক সরদার ফজলুল করিম। সেখান থেকে উদ্ধৃতি: 'প্লেটোর রাষ্ট্রে শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, শিক্ষা হচ্ছে নাগরিকদের স্বাভাবিক গুণ – নির্ধারণের উপায় এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রত্যেক নাগরিকের চরিত্রবিকাশের প্রধান মাধ্যম। তাই পরিকল্পিত এই রাষ্ট্রে শিক্ষার পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র ব্যতীত অপর কারও এখতিয়ারে ন্যস্ত থাকতে পারে না। প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা স্পার্টার জন্য অভিনব কোনো ব্যাপার না হলেও এথেন্সের প্রচলিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা অপরিচিত এবং অভিনব ছিল বলে ইতিহাসকারগণ মনে করেন।' ইতিহাসের শিক্ষা থেকে শিক্ষা গ্রহণ জাতির কাছে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন তা যেমন যুগোপযোগী তেমন কার্যকর। এই শিক্ষানীতি রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সামগ্রিক মানবশিক্ষার যোগকে এক করেছে। প্রথম শিক্ষানীতি পেয়ে জাতি শিক্ষার দিক-নির্দেশনা পেয়েছে। প্লেটোর মতো আবার বলতে চাই: 'শিক্ষাব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় এবং সামগ্রিক।'

২.

সংস্কৃতি জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের অভিজ্ঞতা। মানবজীবনের বর্ণাঢ্য রূপ প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতিতে। সংস্কৃতির বৈচিত্র্য মানবজীবনের সম্পদ। গ্রহণ-বর্জন সংস্কৃতির সাধারণ ধর্ম। যা কিছু ভালো তা গ্রহণ করে সংস্কৃতি। যা কিছু মন্দ তা বর্জন করে সংস্কৃতি। এই গ্রহণ ও বর্জন সংস্কৃতিকে পরিশীলিত করে।

আপন সংস্কৃতির পরিচর্যা মানবজীবনের সাধনা। এর থেকে বিচ্যুত হলে মানুষ হারায় তার শেকড়ের সন্ধান। ব্যক্তি তার শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলে রিফিউজি ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তার ইতিহাস-ঐতিহ্য তাকে আশ্রয় দেয় না। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামনে এটি একটি গভীরতম সত্য। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের ন্যূনতম চাহিদা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ। নইলে রাষ্ট্রীয় ভিতে ফাটল ধরে, সে ফাটলে নোনাজল ঢুকে ভাসিয়ে দেয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন, হরণ করে অধিকার। অক্ষরজ্ঞান তাই গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিভূমি। সাক্ষরতা

ছাড়া গণতন্ত্রের বুলিই কপচানো যায়, তাতে 'শৌখিন মজদুরি' আছে বটে, নেই 'সার্থক গানের পসরা'। উন্নয়নশীল দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে সাক্ষরতা এবং নূন্যতম জনশিক্ষার অভাবে সার্থক দায়িত্ববোধসম্পন্ন সরকার যেমন নেই, তেমন নেই কল্যাণাভিসারী জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ বিরোধী দল। ফলে ডেমোক্রেসির বদলে মিলিটারি অ্যারিস্টোক্রেসিই হয় এসব দেশের সম্বল। নিরক্ষরতার সুযোগে জনগণের সকল অধিকার হরণ এসব দেশের বৈশিষ্ট্য। এবং পরিশেষে ডেমোক্রেসি নয়, বন্দুকই শাসন করে দেশ।

উন্নয়নশীল দেশগুলোয় এ ধরনের বিপর্যয়ের পেছনে কাজ করে বিশেষভাবে দুটো উপাদান। এক. জনসাধারণের সাক্ষরতার অভাব। দুই. নারীদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে পিছিয়ে রাখার প্রবণতা। রাজনৈতিক প্রাগ্রসরতা যদি নিশ্চিত করে ডেমোক্রেসি, তবে অর্থনৈতিক প্রগতি জাতিকে দীর্ঘকাল স্থায়ী নীরোগ স্বাস্থ্য দান করবে। কিন্তু এতেও কিছু হয় না, যদি না গোটা জাতির মানসচেতনা গভীরতর হয়, তার প্রকাশ না ঘটে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চায়, কল্যাণধর্মী মানবিকতাসম্পন্ন সাহিত্য, সংগীতে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে। একসময় এশিয়ার নিরক্ষর জনসাধারণের দুর্বলতার সুযোগে বিদেশি সংস্কৃতি এসে স্বদেশি সংস্কৃতিকে বিকৃত করেছে। শিক্ষার অভাবে তারা নিজেদের সংস্কৃতির মূল্যায়ন করতে পারেনি। ফলে সামন্তবাদী বিকৃতি ও বিদেশি প্রভাবের অনুপ্রবেশের ফলে উন্নয়নশীল দেশের জনগণ দিশেহারা এবং বিক্ষুব্ধ। এ সংকট বাংলাদেশেরও।

মানবজীবনের সাংস্কৃতিক শিক্ষা জাতির জন্য মননশীল ও সৃজনশীল প্রকাশের যাত্রা। এই শিক্ষা ছাড়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পূর্ণ হয় না। মানবজীবনের মৌলিক সত্য গভীরতর বোধে শাণিত হয় সাংস্কৃতিক শিক্ষায়। বলতেই হয় সাংস্কৃতিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মুকুটমণি স্বরূপ নিঃসন্দেহে।

৩.

সাহিত্য বৃহতের সাধনায় মানবজীবনের অন্তরঙ্গ প্রকাশ। সভ্যতার সূচনা থেকে মানুষ নানাভাবে নিজেকে সৃজনশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। গুহাবাসী জীবনযাপনের সময় গুহার দেয়ালে চিত্র এঁকেছে। গান গেয়েছে, মুখে মুখে গল্প বলেছে। এই অন্তরঙ্গ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম সাহিত্য। সভ্যতার স্রোতে সাহিত্য টিকে থেকেছে মানবজীবনের গল্পের বজরায়। ঘাটে ঘাটে ভিড়েছে। বাঁকবদল ঘটিয়েছে। তৈরি হয়েছে নতুন আঙ্গিক। মানুষের সত্যদর্শন মানুষের আপন বলয়ে ঘুরিছে অনবরত। কবি যখন উচ্চারণ করেন, 'বল বীর চির উন্নত মম শির'– তখন তিনি একের মধ্য থেকে বহুতে বিস্তৃত হন। ষোড়শ শতাব্দীর কবি যখন বলেন, 'যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে জন কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি' – তখন তিনি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নবতর সংযোজন ঘটান। কারণ তারও আগে, বাংলা সাহিত্যের আর একজন কবি দ্বাদশ

শতাব্দীতে উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর কবিতায়, 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী'। অর্থাৎ আজ থেকে ভুসুকু বাঙালি হলো। একজন কবি নির্ণয় করলেন তাঁর জাতিসত্তা। অন্যজন তাঁর মাতৃভাষাকে গৌরবমণ্ডিত করলেন। অন্যজন মানুষকে বললেন, মাথা উঁচু করে রাখাই বীরের ধর্ম। এই বীর যুদ্ধক্ষেত্রের বীর নন। তিনি জীবনযুদ্ধের প্রকৃত মানুষ। যিনি নতজানু হতে জানেন না। সাহিত্য এভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, তার মানবিক আবেদনের সবটুকু নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমি আছি' এই সত্যকে রক্ষা করাও যেমন মানুষের আত্মরক্ষা, তেমনি 'আমি জানি' এই সত্যকে রক্ষা করাও মানুষের আত্মরক্ষা – কেননা, মানুষের স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞান-স্বরূপ।.... 'আমি আছি' আমাকে টিকে থাকতে হবে, এই কথাটি যখন সংকীর্ণ সীমায় থাকে, তখন আত্মরক্ষা বংশরক্ষা কেবল আমাদের অহংকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু, যে পরিমাণে মানুষ বলে যে, অন্যের টিঁকে থাকার মধ্যেই আমার টিঁকে থাকা, সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয়; সেই পরিমাণে 'আমি আছি' এবং 'অন্য সকলে আছে' এই ব্যবধানটা তার ঘুচে যায়। এই অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য; সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানাপ্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। ... তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজনসাধনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার সেবায় ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।'... প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই, সেখানে সে যা আনে তাই খায়। যাকে নিজেই সম্পূর্ণ শোষণ ক'রে নিয়ে নিঃশেষ না করতে পারি, তাই দিয়েই তো প্রকাশ।'

মানুষের জীবনে এই প্রকাশ এক ধরনের সম্পদ – এর বিনাশ এবং ক্ষয় নেই। তাই সাহিত্য মানবজীবনের অবিনাশী আয়োজন। শিক্ষার অনুষঙ্গ এবং মননের বিস্তার। এই শিক্ষা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, প্রদীপ্ত করে। সেজন্য সাহিত্যের প্রয়োজন মানবজীবনের আলোকিত চিত্তের স্বরূপ অন্বেষায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অনন্তের স্বরূপ। শিক্ষার এই স্বরূপ যে জীবন ধারণ করতে পারে না তার ভেতরের শূন্যতা মানবিক চিন্তার হন্তারক। জাতিকে এর মূল্য দিতে হয় দুর্নীতিতে, সন্ত্রাসে, হত্যায় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুর্বল করার প্রয়াসে। সাহিত্য এই অর্থে মানবজীবনের প্রজ্ঞা, যে শিক্ষা দিয়ে সে তার ভ্রান্তি, অজ্ঞতাকে দূর করতে পারে।

শিক্ষা মানবজীবনের মৌলিক শর্ত – সংস্কৃতি জীবনের সত্য-সুন্দরের সাধনা – সাহিত্য জীবনের আরাধনা, যে আরাধনা পুষ্পিত করে জীর্ণ জীবনের পরিসর। ব্যাপ্ত অর্থে মানবজীবন সমষ্টির সমন্বয়। যে সমন্বয়ে অগ্রগতি হয় সভ্যতার। সমন্বিত শিল্পরূপের ভেতরে মানবজীবন করায়ত্ত করে শিক্ষার আলো। উদ্দীপ্ত করে প্রজন্মকে, যে প্রজন্ম আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

বিদেশি একটি গল্পের উল্লেখ করতে চাই তরুণ শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। এটি একটি পেন্সিলের গল্প। দাদুকে টেবিলে বসে লিখতে দেখে নাতি ছুটে এসে বলে, দাদু তুমি কি আমাকে নিয়ে কিছু লিখছো? দাদু লেখা থামিয়ে বললেন, তোমাকে নিয়েই লিখতে বসেছি। কিন্তু ভাবছি, তোমাকে নিয়ে আমার লেখার চেয়ে এই পেন্সিলটার গুরুত্ব অনেক বেশি। আমি দোয়া করি তুমি এই পেন্সিলের মতো হবে।

নাতি পেন্সিলটার দিকে তাকিয়ে বললো, এ আর এমন কি? এতো একটা পেন্সিলই।

দাদু বললেন, আসলে তুমি কীভাবে জিনিসটা দেখছো তার উপরই অনেককিছু নির্ভর করে। তোমাকে জানাতে চাই যে এই পেন্সিলটির পাঁচটি গুণ আছে। যে এই গুণগুলো অর্জন করবে সে অনেক বড় মানুষ হবে। নাতি আগ্রহ নিয়ে বলে, পেন্সিলের গুণের কথা তুমি আমাকে বলো দাদু। দাদু বলতে শুরু করলেন। প্রথম গুণ: এর পরিচালনার ক্ষমতা। তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তোমার প্রতিটি দিন বিশেষ কারো দ্বারা পরিচালিত হয়। তোমার হাত পেন্সিলকে যেমন পরিচালনা করে তোমাকেও তিনি তেমন পরিচালনা করেন। তিনি আমাদের সবার সৃষ্টিকর্তা। দ্বিতীয় গুণ: মাঝে মাঝে লেখার সময় পেন্সিলটা শার্পনার দিয়ে ধারালো করতে হয়। পেন্সিল এতে কষ্ট পেলেও এর শিসটা তীক্ষ্ণ হয়। তোমাকেও বুঝতে হবে যে জীবনে দুঃখ-কষ্ট আছে। দুঃখ-কষ্ট তোমাকে খাঁটি মানুষ করবে। তৃতীয় গুণ: পেন্সিলে লেখার সময় ভুল হলে তা রাবার দিয়ে মোছা যায়। এর মানে হলো ভুল হলে তা সংশোধন করা দোষের নয়। অন্যায়কে সংশোধন করলে ভুল পথে যাওয়ার সুযোগ থাকে না। চতুর্থ গুণ: পেন্সিলের বাইরের রঙের চাকচিক্যের চেয়ে ভেতরের শিস অনেক কাজের। এরদ্বারা বোঝায় মানুষকে বাইরে থেকে যেমন দেখায় তার চেয়ে ভেতরের গুণটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চম গুণ: পেন্সিলের দাগচিহ্ন কাগজের উপর থাকে। একইভাবে মানুষ যা কিছু করবে তার চিহ্ন থেকে যাবে। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিটি কাজ ভেবেচিন্তে করতে হবে।

বিদেশি গল্পের এই মর্মটুকু মানবজীবনের আলোর জ্যোতি। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য এই জ্যোতি শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের স্বরূপ। এই জ্যোতি আলোকিত করে মানবজীবন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি পেন্সিলের গল্পের সবটুকু যোগ করলে শিক্ষার গুণগত মান বিকশিত করবে শিক্ষার্থীকে। দেশের মানুষের প্রত্যাশা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে গুণগত শিক্ষাকে একইভাবে অর্জন করে প্রজন্মের দেশচেতনার আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে। অন্যথায় পিছিয়ে থাকার হতাশা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেবে। কাঙ্ক্ষিত জাগরণ ঘটবে না। আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডির বাইরে শিক্ষার মর্যাদায় বলিষ্ঠ - দীপ্ত থাকবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি।